ভূমিকা

“সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়” : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহমৃত্তিকার উৎখননের চাতুরি চলছে। ভেঙে পড়ছে একের পর এক প্রচলিত মূল্যবোধ। নড়বড়ে, দ্বিধাক্লিষ্ট বিশ্বাসভূমে মানুষেরই আড়চোখের ঘুণপোকা বসত পেড়ে আছে। অধিকন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ নরমেধ, অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলন, গান্ধি-গোলটেবিল ইত্যাদি ইত্যাদির চলসারণী। বাঙালির প্রাপ্তি বলতে এক ’১৩-য় মিস্টিক রবীন্দ্রঠাকুরের বিশ্ব (নোবেল)-বিজয়। আর কিছু বছরের মধ্যেই ইংরেজের ১৯০ বছরের লুঠতরাজ অন্তিম শ্বাসবায়ু নেবে, টলমল আকাশ দেখবে ‘স্বাধীনতা’। অযুত ‘স্বদেশী সন্ত্রাসী’-র রক্তের বিনিময়মূল্যে আসা স্বাধীনতা, রঙ্গলাল-কথিত স্বাধীনতা।... এমত পটপ্রেক্ষায় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সুদূর বর্মামুলুকে জন্ম নিচ্ছেন বাংলা সাহিত্যের এক স্পর্ধিত বিনয় : বিনয় মজুমদার (১৯৩৪ খ্রিঃ-র ১৭ সেপ্টেম্বর—২০০৬ খ্রিঃ-র ১১ ডিসেম্বর)।

তারপর শৈশবেই অগণন মানুষের সঙ্গে তাঁর সপরিবার জন্মস্থানত্যাগ, জাপানি আক্রমণের ভয়ে, যেখানে মৃত্যুর আগ অবধি তিনি আর ফিরে যেতে পারেননি। তারপর কয়েক বছর অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে বসবাস, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণ এবং তারপর পুনরায় দেশান্তরী। পশ্চিম বাংলার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ঠাকুরনগরের শিমুলপুর গ্রামে তাঁর নিয়তির শেষ বীজ প্রোথিত হচ্ছে। দীর্ঘ জীবনের দীর্ঘতম স্বেচ্ছানির্বাসন-পর্ব সমাপ্য করে এখানেই তিনি নির্বাণ নেবেন নব্য শতকের মোমজ্বলনের অনতি পরে।

যতটা পথ পেরলে একজন মানুষকে হ্যাঁ-মানুষ কিংবা পথিক বলা যাবে, সেই ন্যূন মার্জিন তাঁর দখলে। কিছু অংশে তা ভাগ্যবিড়ম্বিত, কিছুটা স্বকপোলকল্পিত, আবার কতকটা নিজেরই আরোপিত। আসলে সমাজ-বিন্যস্ত প্রমিতকরণের পরোয়া তিনি করেন না। অন্যথায় ‘অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ’-এর চাকরি, ‘ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট’-এ ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ‘ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কলেজ’-এর অধ্যাপক অথবা ‘দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট’-এর ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিতে তিনি ‘ভয়াবহভাবে সৎ’ ও তথাকথিত সুখী মানুষের জীবন কাটাতেই পারতেন। তবু বাধ্যতার রাজপাট–এর বদলে নিছক ভালোবাসার বনবাস তাঁকে টানল।...

সাহিত্য, মূলত কবিতামাধ্যমকে কেন্দ্র করে জীবনে তিনি ফের নির্মিত হলেন। নির্মাণ-বিনির্মাণ-অবিনির্মাণের অভিকেন্দ্র-অপকেন্দ্র বলের খেলাভোলায় তিনি হয়ে উঠলেন নিপুণ কবিতামিস্তিরি (Poetry Maker)। কালের হিসেবে তিনি পঞ্চাশের দশকের শেষদিককার

লেখক। '৫৮-য় (১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্রের আলোয়' দিনের আলোয় আসে। কিন্তু, সেই অর্থে যে 'প্রথম বিস্ফোরণে কতিপয় চিল' বলে উঠবে 'এই জন্মদিন', তারজন্য তাঁকে ও বাংলা কবিতাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। জীবনানন্দোত্তর বাংলা কবিতাধারার অন্তঃপ্রশাখা ধরে নতুন করে নাড়া দেওয়া এই কবিতার বইয়ের নাম 'ফিরে এসো, চাকা'। ('ফিরে এসো, চাকা'-র ১ম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ফিরে এসো, চাকা', প্রকাশক 'গ্রন্থজগৎ'-এর পক্ষে শ্রী দেবকুমার বসু, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর। 'ফিরে এসো, চাকা' এরপর 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন। ১৯৬৫-র ৩১ জুলাই প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-তে 'আমার ঈশ্বরীকে'-র সমস্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে আবার 'ফিরে এসো, চাকা' নামের এই গ্রন্থের কোলকাতা সংস্করণ প্রকাশ করেন বুদ্ধদেব বসু-কন্যা মীনাক্ষী দত্ত, ১ মার্চ, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ।)

তাঁর সৃজনসম্ভবা কলম প্রায় ওই একই সময়ে এক বিস্ময়কর মগ্নমনোফসল তৈরি করে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' নামে। (১৩৭৩ বঙ্গাব্দের অঘ্রান মাসে এটি লিখিত, প্রকাশিত ১৩৮১ বঙ্গাব্দে।) এটিকে 'মহাকবিতা'-র তক্‌মা দেওয়াটাই হয়তো বা সঙ্গত হবে। এরপর 'বাল্মীকির কবিতা' (১৯৭৬ খ্রিঃ), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৮১ খ্রিঃ), 'আমাদের বাগানে' (১৯৮৪ খ্রিঃ), 'আমি এই সভায়' (১৯৮৪ খ্রিঃ), 'এক পঙক্তির কবিতা' (১৯৮৮ খ্রিঃ), 'আমাকেও মনে রেখো' (১৯৯৫ খ্রিঃ), 'আমিই গণিতের শূন্য' (১৯৯৬ খ্রিঃ), 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' (১৯৯৯ খ্রিঃ) ইত্যাদি— তালিকা খুব দীন নয়।

তাঁর সমধারার, সমান্তরাল ধারার এবং অন্য ধারার গদ্যচর্চার নিদর্শন 'বিনয় মজুমদারের ডায়েরি' (১৯৯৪ খ্রিঃ), 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য' (১৯৯৫ খ্রিঃ), 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১৯৯৮ খ্রিঃ), 'বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প' (১৯৯৮ খ্রিঃ) গ্রন্থগুলি। রুশ ভাষাবিদ বিনয় মূল রুশ থেকে ৫টি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন— 'মানুষ কী করে গুণতে শিখল', 'অতীতের পৃথিবী', 'সূর্যগ্রহণ', 'বায়ুমণ্ডল' ও 'সেকালের বুখারায়'। 'Theory of Relativity' বিনয় ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বিজ্ঞানী শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র ভূমিকাঋদ্ধ এ বই প্রকাশ করে 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি'। এ ছাড়াও গণিতশাস্ত্রের উপর লেখা বিনয়ের এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত এবং কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ৩টি গ্রন্থ হলো 'Interpolation Series', 'Geometrical Analysis and Unital Analysis', ও 'Roots of Calculus'।

এবং এই তালিকাও কোনওভাবেই সম্পূর্ণ নয়। কেন না, আজীবন অবিবাহিত ও অগোছালো

বিনয় তাঁর জীবনের মতোই সৃষ্টিরও বড় একটা রেয়াত করতেন না। নচেৎ, উপরের গ্রন্থতালিকা যার 'সাধের সাধনা', তাঁর আপ্ত ক্যানভাসে এক ধরনের স্বহননবোধ কেন বারবার ছায়া ফেলে যাবে? কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রবাদপ্রতিম 'হাংরি অ্যানার্কিস্ট' বাসুদেব দাশগুপ্ত সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছিলেন— "অন্তত আমার কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার বাসুদেব আত্মহনন নয়, আত্মখনন করছে। যারা অশিক্ষিত এবং ইডিয়ট্, তারাই একমাত্র আমার এ উক্তিকে অ্যালিটারেশন্ হিসেবে নেবে।" কথাটা বোধহয় বিনয় মজুমদার সম্পর্কেও খাটে!

প্রেসিডেন্সি-শিবপুরের জুয়েল বিনয় তাঁর প্রাপ্য, তাঁর জন্য বরাদ্দ শাদা রাস্তা ছেড়ে এক কথায় কাঁকুরে নামপথে সরণ (আদতে শরণ) নিলেন। এ কি তাঁর তিমিরবিলাস? নাকি জনারণ্যে বিদ্ধ (কিংবা বধ) হয়ে যেতে যেতে নামসাকিন পুনরুদ্ধারের আর্তি? এক বাক্যে উত্তর করা মুশকিল। প্রতিভা অপচয়ের যাবতীয় দায় অবশ্য মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে স্বচ্ছন্দ। নতুবা, এ-কথাও ভুলে যাওয়ার নয় যে, সোভিয়েত বিপ্লবের স্বর্ণযুগেই কিন্তু মায়াকভস্কি আত্মহত্যা করেছিলেন। স্বরচিত মৃত্যুপ্রক্রিয়াকেই কীভাবে আরও শিল্পসম্মত করা যায়, তার জন্য শেষ ১৫ বছর ধরে নিজেকে তিলে-তিলে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন তুষার রায়। অন্তত বিনয়ের সমসাময়িক বাঙালি লেখক-শিল্পীদের একটা বড় অংশকেই দেখা গেছে ধারাবাহিক 'অলীক অনল'-এ পুড়তে ও পোড়াতে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, তুষার রায়, কবিরুল ইসলাম, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, জ্যোতির্ময় দত্ত, তারাপদ রায়, সামসুল হক প্রমুখ একই সঙ্গে জন্মপ্রেমিক, তীব্র অভিমানী এবং সুষ্ঠু হাতঘড়ির কেয়ার না করা নিষ্ঠ দহনের রূপকার।

অবশ্য তুষার রায় বাদে আর সকলের সঙ্গেই বিনয়ের একটা মৌল পার্থক্য রয়েছে। ওঁরা কবিতাকার, বিনয় নিজেই কবিতা! প্রকৃত কবিতার মতোই আলোয়-আঁধারে, রহস্যময়তার অস্পষ্ট বলয়ে তাঁর দুরূহ অধিষ্ঠান। কবিতার ধর্ম আর জীবনের জিরাফের দ্বন্দ্বে 'রাজধর্ম' পালনকারী ক্ষত্রিয়! 'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম' তিনি বেছে নিয়েছেন। 'কবিতাযাপন' বলে আশ্চর্য এক শব্দ তিনি বুক ঠুকে বানাতে পেরেছেন— এ তাঁর তরফের 'ঈশ্বরকে মিস্‌ড কল'!

অন্যদিকে, জীবনের সহজ অঙ্ক মেলাতে তিনি ব্যর্থ। বুঝি সেই অসহ আত্মধিক্কারেই বাকি জীবন শিরায়শোণিতে কবিতা ও গণিতের যৌথ কারবার করে গেলেন। আর এই নিক্তিতে বাংলা সাহিত্যে তিনি এক, অনন্য ও স্বতন্ত্র। কবিতার সমীকরণ গণিতে মেলানোর বিরলপ্রয়াসী। কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-র অতীতচারণ বলে— "...একদিন ইউক্লিড-বিনয়/ মানুষ নিকটে গেলে কেন প্রকৃত সারস উড়ে যায়/ জীবনানন্দীয় দ্বিধায় আমাদের বোঝাবার

চেষ্টা করেছিল!" ('কফি হাউসের সিঁড়ি', 'কফি হাউসের সিঁড়ি') এখন এই যে 'জীবনানন্দীয় দ্বিধা', এই তো বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্পীমানুষের মানসগঠন। তা না হলে, "প্রথম চাকরিটা না ছাড়লেই ভালো হতো বোধ হয়— চাকরিটাও চালাতাম, টুকটাক কবিতাও লিখতাম— বেশ চ'লে যেতো। কী যে হলো— এলোমেলো হয়ে গেলো সমস্ত কিছু।" জাতীয় আক্ষেপোক্তির প্রয়োজন পড়ল কেন বিনয়ের?

আবার ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রেখেছিল তাঁর উঠোনের কোণে। গায়ত্রী নাম্নী এক নারীকে কেন্দ্র করে তাঁর কবিতার মানচিত্র, মানদণ্ড, ও মানপত্র আবর্তিত হলো। 'তুমি যেন ফিরে এসে পুনরায় কুণ্ঠিত শিশুকে/ করাঘাত ক'রে ক'রে ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে/ আড়ালে যেও না;...' ('২৯ জুন ১৯৬২', 'ফিরে এসো, চাকা') থেকে 'আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে,/ তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,/ চিঠি লিখব না।// আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়।' ('আমরা দুজনে মিলে', 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ')-এর স্বপ্নসিদ্ধ উচ্চারণ অবধি আসলেই এক কবির উত্তরণ ঘটে গেছে। কিছু প্রেম, কিছুটা বিদ্রোহে প্রস্তুত নিভৃত শব্দাবলির কোথাও কী করে যেন 'গায়ত্রী' নামধারী অনিত্য এক নারী নিত্য মন্ত্র হয়ে উঠেছে! আর ভালোবাসা কী, ভালবাসবার পান্থপথটিই বা কী (what is love and how to love)— এর সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে অফুরান বিনয় নিজে হয়ে উঠেছেন 'মিথ': জেন জ্যোৎস্নায় যিনি স্বসঙ্গ করেন; অবশিষ্ট আত্মময় দিন যাঁর এমন গিয়েছে, যেন— "কখনও তো মেঘ হোক/ দৃষ্টিও বিশ্রাম পাক/ চাঁদ-দেখা থেকে" ('জেন জ্যোৎস্নায় মায়াময় হাইকু : অনুবাদে মাৎসুও বাশো', 'মাৎসুও বাশো ও জ্যোৎস্নাময় হাইকু')

এদিকে, চিরকুমার কবির কৌমার্য কবিতায় প্রক্ষেপ ফেলবে। জীবদ্দশায় সংঘটিত তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, হাংরি আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন ইত্যাদি সেভাবে তাঁকে ভাবিত করেনি কখনও। নিদেনপক্ষে তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেনি বললেই চলে। তাঁর কবিতা অনেকটা চিরজীবীদের গান হয়েই তাঁর পুরাপদ (Mythological Status)-কে অচ্যুত রেখেছে। পদাঘাতে রবীন্দ্র রচনাবলি ভূলুণ্ঠিত করা-দের দলে তিনি তাই কখনওই পড়েন না, পঞ্চাশের কবিতা-আখড়ার স্বভাবপুরুষ সে-অর্থে তিনি নন। বরং, জীবনের প্রাণের রেলগাড়ির পাশজানলা (Window Seat)-টি যে তিনি কবিতাকে ছেড়েছেন, সেখানে বিনয় নেই— স্পর্ধা আছে, অনেকটা : "মরক্কোবাসীরা কাগজ তৈরি করেছিল/ ফিনিশিয়রা হরফ/ কবিতা সৃষ্টি করলাম আমি"-র আত্মরণ। (অফজল আহ্‌মেদ সৈয়েদ, 'কবিতা সৃষ্টি করলাম আমি', 'পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিতা')

আর, কবিতার আঙ্গিকে বাঁধা জীবনাচরণকে বারবার করে অতলান্তে নামিয়ে এনেছে তাঁর

মানসিক বিকারব্যাধি। কবির যশোলেখ সদ্য যখন গ্রীবাভঙ্গিমায় অভিনবত্ব পাচ্ছে, ঠিক তখনই বুঝি নিয়তির হ্যাঁচকা অছিলায় তা কোনও স্থগিতাদেশের উপক্রম নেবে। তারপর মাত্র ২৮ বছর বয়েসের যৌবন-মধ্যাহ্ন থেকে আমৃত্যু তাঁকে এই দুশ্চিকিৎস্য ভবিতব্যের ক্রীতদাস বনে যেতে হলো। আর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কখনও কফিহাউসের বেয়ারাকে দরজার হুড়কো খুলে আক্রমণ, কখনও বা বিনা পাসপোর্টে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ ও স্বেচ্ছায় পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ এবং কারাবাস গ্রহণ। কবি কি তবে কাঁটাতারের মানা ভুলে রূপকথার পাখির ডানায় যূথরাষ্ট্র ছুঁতে চান? তাহলে পরেই কি বলে বসবেন— "...আমার হাত ফুঁড়ে নদীকে জল দিতে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণাধারা/ সমস্ত মানুষের হৃদয়ই আমার পরিচিতি" (মাহমুদ দারবিশ, 'পাসপোর্ট', 'অধিকৃত ভূখণ্ডের কবিতা') পৃথিবীর সব সীমান্ত তাঁকে বিরক্ত করে, রুশ কবি এফগেনি এফতুশেংকো যেমন : এলোমেলোভাবে লন্ডনের পথে-পথে ঘুরতে যাঁর ইচ্ছে হয়, নাবাল বালকের মতন ইচ্ছে হয় সকালবেলার প্যারিসে বাসে চড়ে বেড়াতে ('সীমান্তের বিরুদ্ধে', 'অন্য দেশের কবিতা')। কিন্তু, শৈশবে আর তো ফেরা যায় না! যায় কি?... মগ্নচৈতন্যের একজন মানুষের এহেন আকস্মিক মানসবৈকল্যের (বা মানসশৈথিল্য— যা-ই বলা হোক না কেন) নেপথ্যে কিন্তু চাঞ্চল্যকর এক সমাজনৈতিক কারণ সম্প্রতি উত্থাপন করেছেন কবির সম্পর্কিত ভাগ্নে উত্তম বিশ্বাস মহাশয়। তাতে কবির 'ফুল দেব কার হাতে', 'সাদর আহ্বানে সাড়া দিই' প্রভৃতি কয়েকটি পাণ্ডুলিপির তিক্ত ও অদৃশ্য পরিণামের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অভিযোগের তির স্পষ্টতই কিছু শহুরে প্রকাশনার কারচুপির দিকে। এর নিহিত সত্যাসত্য সময় জানান দেবে। কিন্তু বিনয়ের মতো খেয়ালী ও আত্মলীন স্রষ্টা যে হরবকত নিওনের ধূর্ত দেয়ালে এসে প্রতিহত হবেন, এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মনে হয় ত্রিকালদর্শনের দরকার পড়ে না। অতএব এক গাঢ় বিষণ্ণতাবোধে বিনয় আক্রান্ত হলেন। নিজেকে ক্রমশ গুটিয়ে নিলেন তিনি। তাঁর যে সৃষ্টি আমরা পেতে থাকলাম, তা ব্যক্তিমানসের সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসের সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে অগুণিতবার। নগরকল্লোলকে যে মুহূর্তে বুদ্‌বুদ্‌-নগরীর ক্রেংকার (Cacophony of a Bubble City) বলে মনে হয়েছে, ততবারই বিনয় বি-লক্ষণার দিকে হেঁটেছেন। নির্মম বস্তুজগৎ (Realistic World)-এ নিছক একটা ভাব (Idea) হয়ে বেঁচেবর্তে থাকার অকায়িক অস্তিত্ব (Virtual Existence)-এর অবতারণা করেছেন। আবার এরই কৌণিক দূরত্বে আবহমান প্রকৃতি ও বিপুল মানবগোলার্ধের অন্তর্লীন তথ্যসূত্র আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। কিন্তু, একদা ঘনিষ্ঠ শহরাঞ্চলের চোখে তিনি বদলে গিয়েছেন 'হিংসুটে দৈত্য'-য়। নইলে, নিমন্ত্রণবাড়িতে পঙক্তিভোজনে বসে সকলের পাতের খাবার নজর করবার মতো হীনমন্যতা দেখানো বা তুল্যমূল্যায়ন ঠিক বিনীত নয়, কবিজনোচিতও নয়। "করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি।"— এই শোকে

ক্ষিপ্ত তিনি? "নাকি ভ্রান্তি হয়েছে কোথাও?"... ওষ্ঠে ঝুলে থাকা প্রহৃত চুম্বন আর ভূকম্পপ্রবণ সমস্ত হৃদয় বয়ে অদ্ভুত আঁধারে হেঁটে ফেরা বিনয় ও তাঁর দুর্বিনয়ের আখ্যানের অন্তর্পত্রটিই এ-গবেষণার প্রতিপাদ্য। পাখির অক্লিন্ন চোখ প্রতি শল্কে জমাট রাত্রির স্তন চিরে দুধশাদা ভোর তুলে আনতে চেষ্টা করেছে!...

আর, গবেষণান্তে মনে পড়ছে কিছু মানুষকে, যাঁরা বন্ধনীকরণে আমায় ঋণগ্রস্ত করেননি এবং সমানে ঋণী করেছেন। নাম না নিলে তাঁদের কিছু আসে-যায় না, কেননা প্রত্যেকেই তাঁর-তাঁর ভূমিতে শীর্ষস্পর্শী। তাছাড়া, 'কৃতজ্ঞতা' নামক 'বোঝা' নামিয়ে রেখে অপরূপ শূন্য হওয়ার অবকাশও সেক্ষেত্রে থাকেই; তবু এই আত্মবিস্মৃতির ভারহীনতা সুদীর্ঘকালব্যাপী ভারসাম্য রাখতে যথেষ্ট নয়!...

গবেষণা পদ্ধতির নর্ম (Norm) অনুযায়ী ড. তপন মণ্ডল আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক। আমার গবেষণা-সন্দর্ভটির প্রস্তুতকর্মে তিনি আমায় সময়-অসময় সাহায্য করেছেন। কিন্তু, সম্বন্ধের এই লিখিতনামখানি এতটাই যান্ত্রিক যে ভয় হয়— কোথাও তাঁর হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দে আমার জন্য পাতা স্থিতাসনটি দুলে উঠছে না তো? ভয় করে... বরঞ্চ তাঁকে আমার অভিভাবক বলা যাক। 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' (point of no return)-এ না পৌঁছনো অবধি আমি কোনওদিনই ফিরিনি, ফিরতে পারিনি, পারি না। এমন এক গবেষণাব্রতীকে স্নেহে ও শাসনে প্রয়োজনমতো বেঁধে অত্যন্ত দ্রুততায় গবেষণার সম্যককর্ম শেষ করানো অন্য অনেকের পক্ষেই হয়তো কঠিন হতো। তাঁকে অতলগহন শ্রদ্ধা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিভিন্ন সময় সুপরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা-সন্দর্ভটির মাপ ও মানের সংশুদ্ধি ঘটিয়েছেন।

'ধৃতি' পত্রিকার সম্পাদক কবি শ্রীযুক্ত জহর সেনগুপ্ত মহাশয় বহু স্বল্পপ্রচারিত ও অধুনালুপ্ত ছোট পত্রিকা নিজ দায়িত্বে আমায় প্রতিলিপি করিয়ে দিয়েছেন, যা আমার গবেষণায় অনেক অভাবনীয় সড়কের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর এই বদান্যতা খানিকটা বনমহিষ তাড়ানোর মতোই ব্যাপার! এলাকাজনিত তো বটেই, সাহিত্যিকতাজনিত আত্মীয়তাকেই আদতে তিনি রক্তসম্পর্কের ঊর্দ্ধে স্থাপন করেছেন। প্রকৃত অগ্রজের দায়িত্বপালন বুঝি একেই বলে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকসহ সকল গ্রন্থাগার-সহায়ক আমাকে নিঃশব্দে সহায়তাদান করে গিয়েছেন। দিনের পর দিন টেবিলে ডাঁই করে আসা বই পুনরায় জাতিভুক্ত করে রাখতে একটি দিনের জন্যও তাঁরা বিরক্ত হননি। এছাড়াও, কৃতঋণে জড়িয়েছি 'জাতীয় গ্রন্থাগার', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ', 'জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী', 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী', শিমুলপুরে বিনয় মজুমদারের নামে প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ গ্রন্থাগার', প্রেসিডেন্সি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আর্ট্‌স লাইব্রেরি’ ও ‘শ্রী চৈতন্য কলেজ লাইব্রেরি’ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

শ্রী মোল্লা শাহাবুদ্দীন মহাশয় হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সাহিত্যরসিক ও প্রকৃত বোদ্ধা মানুষ তিনি। তাঁর সঙ্গে করা মৌখিক প্রতর্কগুলি আমাকে অনেক নব্য ও স্বচ্ছ দারুচিনি-দ্বীপ দেখিয়েছে! তিনি অনুগ্রহ করে বিভাগের প্রিন্টিং ও স্ক্যানিং মেশিনদু’টিও আমার ব্যক্তিগত গবেষণাকাজে অকাতরে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বিনতা তাঁকে।

আমার জীবনের যাবতীয় যা-কিছুর নেপথ্যে এই মানুষটি অবধারিত জুড়ে থাকবেন, তিনি কবি-অধ্যাপক গণেশ বসু। তাঁর আশ্রয়ে ও আশ্রয়ের অধিক প্রশ্রয়ে ব্যাপ্ত, উৎকীর্ণ আমার স্নাতক থেকে গবেষক— এই পথপরিক্রমাটি। তাঁর ব্যক্তিক ও ব্যক্তিত্বের উষ্ণতা আমার আরও তৃণাঙ্কুরে স্থিত হোক।

সর্বোপরি, গৃহশিক্ষার দিনগুলি থেকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়-ফেরত অবধি আমার প্রতিটি কাজে পাশে থেকে, ছুঁয়ে থেকে, কাছে থেকে যিনি সঙ্গে থাকা, সঙ্গে সঙ্গে থাকাটি অত্যন্ত প্রয়োজন ও কর্তব্য বলে মনে করেছেন, তিনি মা, নৈকট্যকে মহিমা দিয়েছেন তিনি।... এই সেদিন পর্যন্তও সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে আমাকে অর্থকরী পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে গিয়েছেন বাবা। ‘মা’, ‘বাবা’ দু’টি শব্দই প্রতিষ্ঠান। আমি তাঁদের চরণ ছুঁয়ে যাই।...

এঁদের সবাইকেই আমি অভিসন্ধিহীন পেয়েছি, তার সিদ্ধসূত্র বর্গফল নেই।